Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.89-97
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বর্তমান সমাজে নারীর অভিজ্ঞতা ও নৈতিক সমস্যা : মানবাধিকার রক্ষায় নারীবাদের ভূমিকা

প্রণব কির্তুনিয়া
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

From ancient times till today women have been oppressed and negelected in the society. Civilization has witnessed a lot of progress but the social-condition of women has not changed significantly. In ancient times women were treated as slaves, they were considered as objects of enjoyment by men. In this society, women are constantly being oppressed and neglected by men. The role of women in the development of a nation is undeniable. If we want to move the society forward, we have to protect the women's interest, women's health, women right, and to ensure their social progress. In this paper, I will show how women's interests are being disrupted in the so-called neutral society, how women are constantly being deceived by the rules and regulations of the conventional social system. These norms are acting as patrons of masculinity. How can the male-biased rules and regulations be reformed for a truly humanistic society, in which all members of the society, regardless of gender, will be considered as simple members of this society, no one is a master here, no one is a slave here. And I will try to show what kind of behavior or practice can be used to build a truly humanistic society. In this context we will discuss how feminists have tried to build a proper humanist society, what kind of social system they support and whether it is really relevant to a proper humanist society.

Keywords: Intrinsic Value, Instrumental Value, Society, Humanism, Feminism, Patriarchy.

ভূমিকা: প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত (একুশ শতকের গোড়ায়) সভ্যতার নব নব সংস্করণেরর মধ্য দিয়ে মানুষ বহু কুসংস্কার ও অন্ধকারময় সামাজিক প্রথা সংশোধন করে সভ্য ও উন্নত সমাজ গঠনের প্রয়াস চালিয়েছে। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সভ্য সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে রীতিনীতি উন্নত হয়েছে মানব সভ্যতা। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থানের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রাচীন যুগে হিন্দু শাস্ত্রে চারটি বর্ণের উল্লেখ আছে : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় , বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজের সব থেকে নিম্ন স্তরে ছিল শুদ্রদের অবস্থান। শূদ্র ও নারী উভয়কেই দাস করে রাখা হত। শুদ্ররা ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের দাস এবং নারী ছিল পুরুষের দাস। এদের দাসত্বের মধ্যে আটকে রাখার উপায় ছিল আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব করে দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত করে রাখ। পিতৃতন্ত্রকে (Patriarchy) টিকিয়ে রাখার জন্য নারীকে সর্বদাই অবহেলা করা হতো এবং নানান নঞর্থক বৈশিষ্ট্য বা গুণদ্বারা বর্ণনা করা হত। পিতৃতন্ত্র হল এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে পুরুষের হাতে সমাজের শাসনব্যবস্থা থাকে এবং এই শাসনব্যাবস্থায় নারীকে নিপীড়ন করা, অবদমিত করে রাখা এবং নারী-স্বার্থ পদদলিত করা হয়। এমনকি পুরুষের দ্বারা নারীর নিপীড়ন বা অবদমনের বৈধতা প্রতিপাদনার্থে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থেও পুরুষের দ্বারা নারী অবদমনের বৈধতার সমর্থন মেলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে- 'পুত্র হল সর্বোচ্চ স্বর্গের প্রদীপ এবং কন্যা দুঃখের কারণ'। এমনকি পুরুষের স্বার্থ পূরনার্থেই স্ত্রী বা নারীর জন্ম । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বলা হয়েছে 'পুত্রার্থা হি স্ত্রীয়ঃ'[১]। প্রাচীন সমাজে নারী ও শুদ্রদের শিক্ষার অধিকার, ধন সঞ্চয়ের অধিকার ছিল না। যদি তারা ধন সঞ্চয় করত সেক্ষেত্রে ধনের অধিকারী

হতেন যথাক্রমে তাদের গৃহস্বামী ও প্রভুরা। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে 'ভার্যা, পুত্র ও দাস এই তিন জন অ-ধন বলে শাস্ত্রে কথিত আছে। অর্থাৎ এরা নিজেরা কোন ধন পাবার যোগ্য নয় , বরং এরা যার (গৃহ-স্বামী)এদের ধন পাবে'।

শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে শুধু শুদ্র নয় কুকুর এবং কালো পাখির (কাক) সঙ্গে তুলনা করে সবাইকে অনৃত বা মিথ্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা মনু নারীকে "মিথ্যার মতই অপবিত্র"[২] আখ্যা দিয়েছিলেন।

গৃহ এবং গোষ্ঠীর প্রধান ছিল পুরুষরা এবং তারাই গোষ্ঠী ও পারিবারিক রীতিনীতি তৈরি করত এবং নারীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের মধ্যে দিয়ে নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করে রাখা হত। এমনকি নারীর স্বাধীন সত্তাকেও অস্বীকার করা হত। মনু বলেছেন "পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে, রক্ষতি স্থবিরে পুত্রো ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি"। অর্থাৎ স্ত্রীলোককে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে। নারীরা কখনও স্বাধীন নয়। নারীকে পরাধীন করার সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কংকর সিংহ "ধর্ম ও নারীঃ প্রাচীন ভারত" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখ করেছেন-

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারী
আপন অন্তর হতে" [৩]।

অর্থাৎ নারী সৃষ্টিতে তিনি যেন বিধাতার সাথে পুরুষের ভাগ দাবি করেছেন। কবির উপলব্ধিতে নারী কোন কালে কোন সভ্যতায় পূর্ণ মানুষ হতে পারেনি। পুরুষ হল নারীর দ্বিতীয় বিধাতা।

বর্তমান সমাজ পুরুষতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক:

মানবতাবাদ হল এমন এক বিশ্বাস যেটা কতগুলি নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যে নিয়মগুলো মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উচিত। যেমন আত্মিক, বৌদ্ধিক এবং ভাবাবেগগত দিক গুলো সমান গুরুত্ব দিয়ে সমগ্র মানুষের স্বার্থ চিন্তা করেই নিয়ম নীতি তৈরি করা উচিত। টিম লাহে (Tim LaHaye) মানবতাবাদ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন "Humanism, in brief, is a philosophy (or religion) the guiding principle of which is concentration on the welfare, progress, and happiness of all humanity in this one and only life." [৪] প্রকৃত মানবতাবাদি সমাজের বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট থাকা উচিত। যথা ক) পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা, খ) মানুষের মূল্য স্বীকার করে নৈতিক বিচার করা এবং পেশী শক্তিকে কখনোই নৈতিক বিচারের মানদণ্ড না করা, গ) বিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং ঘ) সমাজে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সম-অধিকার স্থাপন করা। যদিও বর্তমান সমাজে মানবতাবাদি সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণভাবে বা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য করা যায় না তথাপিও এই সমাজের রীতিনীতি প্রণেতা তথা সমাজ কর্তারা দাবি করেন যে এই সমাজ হলো প্রকৃত মানবতাবাদি সমাজ। যদিও নারীবাদী নীতিবিদরা এই দাবিকে খন্ডন করেছেন। লাহে (Mr. LaHaye) বলেন "Most people today do not realize what Humanism really is and how it is destroying our culture, families, country, and one day, the entire world."[৫] বর্তমান সমাজে নারীকে সর্বদাই অবদমিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। গৃহপ্রধান অর্থাৎ গৃহের প্রধান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষসদস্য হন। এই সমাজে সর্বদাই পুরুষ সদস্য নিজেকে নারী অপেক্ষা উন্নত মনে করে এবং নারী-স্বার্থ পদদলিত করে। যেখানে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর মতামত ব্রাত্য থাকে, নারীরা যেন এই সমাজে দ্বিতীয় লিঙ্গ, প্রথম হলো পুরুষ। তাই পুরুষের ভালোলাগা এবং মন্দ লাগা প্রভৃতির ওপর নারীর গুরুত্ব বা মূল্য নির্ধারণ হয় বা নির্ভর করে। এখানে নারী অপেক্ষা পুরুষসদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। নারীর জন্ম, বিবাহ , সন্তান ধারণ,লালন পালন প্রভৃতিতে পুরুষের শাসন পরিলক্ষিত হয়। পুত্র সন্তানের কামনায় একাধিক কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেও স্ত্রীকে সন্তান জন্ম দেওয়ার কারখানায় পরিণত করা হয়। একাধিক পুত্রসন্তানের পরে কন্যা সন্তানের প্রয়োজন বোধ করেন নগণ্য সংখ্যক মানুষ। জন্ম নেওয়ার আগে থেকেই সমাজে নারী অবহেলিত, নিপীড়িত ও প্রতারিত। পণপ্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করার পরেও তা সমাজে বহাল তবিয়তে চলছে। এই সমাজের রীতি-নীতি সবই পিতৃতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। আসলে পিতৃতন্ত্র হল মানবতাবাদের পরিপন্থী। সমাজে ন্যায় বিচারের মানদন্ড কখনোই পেশিশক্তি হওয়া উচিত নয়। মানুষের স্বতমূল্য বা স্বগতমূল্য (intrinsic value) স্বীকার করতে হবে। এটি এমন এক মূল্য যা অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। এই মূল্য ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিজস্ব

মূল্য যে অন্য কোন ব্যক্তি বা সমাজের কোন স্বার্থ পূরণের প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয় -এই ধরনের কোন প্রসঙ্গ স্বতমূল্যের সঙ্গে জড়িত নয় । বর্তমানে নারীর স্বতমূল্য আমরা স্বীকার করি না, তার ব্যবহারিকমূল্য (Instrumental value) স্বীকার করি। অর্থাৎ সে কতটা সমাজের স্বার্থ পূরণ করছে তার উপর নির্ভর করে তার মূল্য কতখানি, তার কোন নিজস্বমূল্য আমরা স্বীকার করি না । যখন আমরা কোনো কাজের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য নির্ধারণ করি তখন কর্মটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেদিকে নজর রাখার সাথে সাথে কর্মকর্তটি কে সেদিকেও নজর দিই । যেমন কর্ম উপলক্ষে কোন নারী রাতে বাড়ির বাইরে গেলে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা, তার বাড়ির বাইরে যাওয়া-রূপ কর্মটিকে বিভিন্ন মন্দগুণ জুড়ে দেওয়া হয় এবং নীতিগর্হিত মনে করা ইত্যাদি । অথচ ওই একই কাজ একজন পুরুষের ক্ষেত্রে নীতিগর্হিত বলা হয় না বা কোন মন্দ জুড়ে দেওয়া হয় না । অর্থাৎ একই কর্মকে ব্যক্তিভেদে কখনো উচিৎ আবার কখনো অনুচিত আখ্যা দেওয়া হয়। বিশেষ পরিসেবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কোন কাজ উচিত আবার অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে সেটা অনুচিত হতে পারে বা কোন বিশেষ পদে অবস্থিত ব্যক্তির জন্য কোন কাজ নির্দিষ্ট থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তি সেই কাজ করলে সেটা নীতি গর্হীত বা আইন বিরুদ্ধ হতে পারে , কিন্তু সাধারণের জন্য অনুমোদিত কোন কর্মকে ব্যক্তিভেদে উচিত এবং অনুচিত হিসেবে উল্লেখ করা হলে বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে নীতিগত দিক থেকে সমাজে দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায়।

যখন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার দায়ভার চাপে প্রশাসনের উপর কারণ প্রশাসন সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। তেমনি এই সমাজ যখন নারীর সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় তার দায়ভার নারীর উপর না চাপিয়ে সমাজকে নিতে হবে। এই সমাজের নিয়ম-নীতি, তত্ত্ব-কাঠামো প্রভৃতি নারীর সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ । অনেকে আবার এও দাবি করেন যে শারীরিকভাবে পুরুষ নারী অপেক্ষা বেশি সক্ষম তাই যৌক্তিকভাবে পুরুষ কর্তৃক নারীর অবদমন নীতিগতভাবে নিঃসৃত হয়। এই যুক্তিটিও অকাট্য নয়। কারণ যুক্তিটির অর্থ হল শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে নীতিগতভাবে অবদমন করবে। বলা বাহুল্য আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাই যেখানে পরিবারের স্ত্রীসদস্য স্বামী অপেক্ষা শারীরিকভাবে সক্ষম তথাপিও স্বামীই স্ত্রীকে অবদমন করে। এরূপ ক্ষেত্রে উপরোক্ত যুক্তি প্রযোজ্য নয়। কারণ সেক্ষেত্রে কিছু স্ত্রী তার স্বামীকে অবদমন করতে পারতো। কিন্তু এরূপ হলে সমাজ এই ঘটনাকে ব্যতিক্রম বলে আখ্যা দেয়। এই ঘটনাকে "ব্যতিক্রম" শব্দটি দ্বারা অভিহিত করার সঙ্গে সঙ্গেই এটা প্রমাণিত হয় যে এই সমাজে নারীরা অত্যাচারিত ও অবদমিত হবে, পুরুষ হলেই ব্যতিক্রম। তাছাড়া একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যদি আমরা দাবি করি কোন ব্যক্তির ক্ষমতা কেবল শারীরিক সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল তাহলে বলতেই হবে আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছি । কারণ সক্ষমতার নির্ণায়ক পেশিশক্তি হতে পারে না। কর্মদক্ষতা, যুক্তি , জ্ঞান , সহনশীলতা, আবেগ, ভালোবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্য , সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তির সক্ষমতার নির্নায়ক। অতএব শারীরিক সক্ষমতার প্রসঙ্গ বর্তমান শতাব্দীতে যুক্তিগত ও নীতিগতভাবে অপ্রাসঙ্গিক । বিশুদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধান করা ও সকলের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত রহিত তথা লিঙ্গ, বর্ন , ধর্ম , শ্রেণি নির্বিশেষে দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলির উপর ভিত্তি করে কোন কাজের ঔচিত্য ও অনৌচিত্য নির্ধারণ করা হলে বলা যায় যে বিশুদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে অর্থাৎ এখানে বিনা বিচারে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত স্বীকৃত নয়।

প্রচলিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার পদ্ধতি:

সমাজের অন্তর্গত সদস্যরা প্রত্যেকেই স্বাধীন। সমগ্র সমাজের উন্নতি নির্ভর করে সমাজের অন্তর্গত সদস্যদের উন্নতি, সুস্বাস্থ্য ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের উপর। এখানে কোন ব্যক্তি অন্যকে অবদমিত করে রাখবেন না, সবাই এখানে সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য। তাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে অন্যান্য ব্যক্তিদের রক্ষা করা, তাদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেওয়া। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে "society is a system of usage and procedures, authority and mutual aid, of many groupings and divisions of control of human behaviour and of liberties."[৬] তারা আরও বলেন "society is a web of social relationship"[৭] সমাজ হল একটি স্থায়ী জটিল জালের মত যার অন্তর্গত সমস্ত সদস্য পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। তাই সমাজের নিয়ম-নীতি তৈরি করার সময় সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে এগুলির দ্বারা যেন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হয়।

প্রকৃত মানবতাবাদি সমাজ গড়তে হলে মানুষের এমন কিছু স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সমাজের রীতি-নীতি, আইন, মানদন্ড, আদর্শ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে ।

বর্তমান সমাজে দাবি করা হয় যে মানুষের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সমাজের রীতি-নীতি, মানদণ্ড, আদর্শ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হয়।

নারীবাদীরা দাবি করেন যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নিয়ম, নীতি, আদর্শ প্রভৃতি নির্মাণ করা উচিত নয় যেগুলো কেবলমাত্র পুরুষপ্রধান বা পুরুষের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য। সমাজে পুরুষ বা নারীর স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে। পরিবেশজনিত কারণে পুরুষ হয় একটু বেশি আগ্রাসী। স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হয়ে ওঠে আর নারী অবলা ও সন্তান বৎসল, মমতা, আবেগ প্রভৃতি সমৃদ্ধ এবং পাশাপাশি নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই দ্বিধাগ্রস্থ। নারী ও পুরুষ হল মানব সমাজের দুটি স্তম্ভ। সমাজে কেবলমাত্র পুরুষ শক্তিশালী, উন্নত বা সক্ষম হলেই সমগ্র সমাজ উন্নত, সক্ষম বা শক্তিশালী হয় না। যেহেতু সমাজের অর্ধাংশ নারী তাই নারীকেও শক্তিশালী, উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। একটি সমাজের সমৃদ্ধ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করছে তার অন্তর্গত সকল সদস্যদের ওপর। একটি সমাজের অন্তগত নারী-পুরুষ সকল সদস্যের উপরই সেই সমাজে সেই সমাজের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। সমাজে নারী অবহেলিত বা অনুন্নত থাকলে সমগ্র সমাজই পিছিয়ে পড়বে অনুন্নত সমাজে রূপান্তরিত হবে। এছাড়াও অন্যদিক থেকে বলা যায় যে প্রতিটি সমাজের প্রতিটি সদস্যের স্বগত মূল্য বা স্বতঃমূল্য বর্তমান। সমাজের সদস্য হিসাবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সমাজের সকল সদস্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা। অতএব সমাজের নীতি-আদর্শ নির্ধারণ করার সময় নারী- পুরুষ উভয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য উপর ভিত্তি করে নীতি-আদর্শ নির্ধারণ করতে হবে, ফলে সেই নিয়মনীতি দ্বারা নারী-পুরুষ তথা সমাজের সকল সদস্যই সুবিচার পাবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সর্মথকরা দাবি করেন যে পুরুষ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নারী দ্বিধাগ্রস্ত এর মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার প্রভেদ। কিন্তু নারীবাদীরা দাবি করেন ক্ষমতার প্রভেদ নয় বরং এর মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের বড় হয়ে ওঠার যে প্রশিক্ষণ অর্থাৎ প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ সুযোগের প্রকারভেদ। সমাজে একজন নারী পুরুষের মতোই প্রশিক্ষণ এবং সুযোগ সুবিধা পেলে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। যখন আমরা দাবি করি যে মানুষের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সমাজের নিয়ম-নীতি তৈরি করা হয়, তখন প্রশ্ন হল যে, যে মানুষের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝায়? রাসেল (Bertrand Russell) বলেন "ম্যান ইজ র‍্যাশনাল এনিম্যাল"। আবার জন রলসের (John Rawls) মতে "মানুষ হলো র‍্যাশনালিটি ম্যাক্সিমাইজার" অর্থাৎ মানুষ মাত্রই চায় পূর্ণমাত্রায় যৌক্তিক হতে। তিনি বলেন যৌক্তিকতার প্রধান লক্ষণ হলো দ্বর্থহীন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। নারীবাদীরা অভিযোগ করেন যে পুরুষই "যুক্তির" লক্ষণ ঠিক করে দেয়, যৌক্তিক বিচার কেমন হবে সেটাও ঠিক করে দেয় পুরুষ! যুক্তি বলতে কী বুঝব এমন এক অবস্থান নেওয়া যার দ্বারা সমাজ সর্বতোভাবে উপকৃত হবে? না, স্পষ্ট কোনো এক অবস্থান বুঝবো যার দ্বারা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? অনেক নারীবাদী মনে করেন পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর গুনসমৃদ্ধ। কারণ নারীর দরদ আছে, ধৈর্য্য আছে, সে সহনশীল এবং সেবাপরায়ণ। এই গুণীগুলো মানুষের ভালো থাকার পক্ষে অপরিহার্য। আগ্রাসন, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার প্রবণতা ইত্যাদি কখনোই মানুষের ভালো থাকার পক্ষে সহায়ক নয়। আবার কোনো কোণো নারীবাদী মনে করেন যে মানুষের পূর্বনির্ধারিত কোন ধর্ম নেই, যদিও আমরা দাবি করি যে মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। সেক্ষেত্রে বলা যায় যে বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তি পরিবেশ জনিত কারণে মানুষের অর্জিত কতকগুলি গুণের বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি একটি। যেমন আবেগ হল একটি বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যদি বৌদ্ধিক বা র‍্যাশনাল জীব হয়েও থাকে তাহলে কোন্ লজিকের নিয়মের দ্বারা র‍্যাশনালিটির সাধারণ ধর্ম ঠিক হয়? আমরা জানি যে লজিকে নানান সিস্টেমের প্রচলন আছে এবং এদের মধ্যে যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য আছে এটা এখনও প্রমাণিত নয়। অতএব র‍্যাশনালিটির স্বরুপ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে মানুষের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৌদ্ধিক স্বরূপকে মানুষের সামান্য ধর্ম হিসেবে মেনে নেওয়ার একটা প্রচলন সমাজে দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পুরুষের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। এপ্রসঙ্গে গিলিগান তার "এক্সিট ভয়েস ডাইলেমাস ইন এডোলেসেন্ট ডেভেলপমেন্ট" প্রবন্ধে হার্শম্যানের একটি সমীক্ষার সাহায্য নিয়েছেন। ১৯৭০ -এ হার্শম্যান "এক্সিট ভয়েস এন্ড লয়ালিটি"নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা দুইভাবে তারা কোন নীতির প্রতি তাদের সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে পারেন- প্রথমত, সংগঠনে থেকে প্রতিবাদ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়ে সংগঠনের নীতির প্রতি নীরব অসম্মতি জানাতে পারেন। বলাবাহুল্য যারা সংগঠনে থেকে সংগঠনের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন তারা সংগঠনের প্রতি আনুগত্য অনুভব করেন। কিন্তু যারা সংগঠন থেকে পৃথক হয় অর্থাৎ সংগঠন থেকে বেরিয়ে যান বা নীরব ভাবে চলে যান তারা সংগঠনের প্রতি আনুগত্য অনুভব করেন না।

গিলিগান বলেন যে এই দুই বিপরীত পথ যেন দুই বিপরীত অভিজ্ঞতাপ্রসূত । পুত্র সন্তান সহজেই তারা চিরাচরিত পরিবার পরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন স্বতন্ত্র জগত তৈরি করে। পরিবারের অনুগত নয় ।

অন্যদিকে দেখা যায় কন্যা সন্তানের অভিজ্ঞতা পুত্র সন্তানের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন, তারা সহজেই তার পরিবারকে ছাড়তে চায় না বা তারা পরিবার থেকে ছিন্ন হয়ে নিজের আলাদা জগত বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে চায়না। তারা তার পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ধরে রাখতে চায়। গিলি গান বলেন যে এক্ষেত্রে বেরিয়ে গিয়ে অসম্মতি জানান অনেক সহজ কাজ । সে যে সংগঠনের কোন নীতির প্রতি অসম্মত তা তার সংগঠন থেকে বেরোনো বা এক্সিটের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং অন্যভাবে বলা হলে তার নিশ্চুপ প্রতিবাদের প্রতিফলন হয়। অপরদিকে যারা সংগঠনে থেকেই সংগঠনের কোন নীতির বিরোধিতা করেন, প্রতিবাদ করেন তারা আসলে সহজে বিচ্ছেদ সমর্থন করে ন। তারা সম্পর্ক ধরে রাখতে চায় এবং একই সাথে যে নীতিগুলো সঠিক নয় তার সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে এই দুটো দিক লক্ষ্য করা যায় পুরুষরা সর্বদাই এক্সিটের মাধ্যমে নিজের সম্মতি প্রকাশ করে। অপরদিকে নারীরা সমস্ত সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অনিয়ম দূর করার চেষ্টা করে। এখানে বলা যায় যে নারী কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে ভাবে না বরং সমাজের সকলকেই আপনভাবে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায় না। অপরদিকে পুরুষ সর্বদায় নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে গিয়ে স্বার্থপর জীবে পরিণত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় প্রকৃত যুক্তির অধিকারী পুরুষ নয় বরং নারী, যে বিশুদ্ধ যুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে পারে । কারণ সে জানে কোন মানুষ একা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই জগতে বেঁচে থাকতে পারে না । সমাজের সবাই সবার উপর নির্ভরশীল। তাই ভেদাভেদ ভুলে একে অপরকে অবদমনের চিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে একে অপরের হাত ধরে সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে হবে । পাশাপাশি সমাজে একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কবির ভাষায় "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"। বলাবাহুল্য এই সমাজে পরিবেশ জনিত কারণে পুরুষের যে বৈশিষ্ট্য তাকেই মানুষের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য বলা হয় এবং তার ভিত্তিতেই সমাজের নিয়ম-নীতি তৈরি করা হয়। ফলত সমাজের চিরাচরিত (Traditional) নিয়ম-নীতির দ্বারা নারীস্বার্থ ক্ষুন্ন হয় ।

লরেন্স কোলবার্গ (Lawrence Kohlberg) একটি সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে এটি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বয়সন্ধিকালে ছাত্র ছাত্রীদের অপেক্ষা অনেক বেশি নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। অপরদিকে ছাত্রীরা নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্থ। এর দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ছাত্রীরা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপটু। ক্যারল গিলিগান (Carol Giligan) তার সহকর্মী কোলবার্গের সাথে সহমত পোষণ করেননি। তিনি কোলবার্গের সমীক্ষাটা যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন, তিনি দেখলেন যে কোলবার্গ ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলেন যথা ক) হাইনস নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী অসুস্থ এবং হাইনসের কাছে ওষুধ কেনার পয়সা নেই। খ) এই পরিস্থিতিতে হাইনসের ঔষধ চুরি করে স্ত্রীকে বাঁচানো উচিত কি না? এক্ষেত্রে ছাত্ররা এই সমস্যাটিকে একটি সাদামাটা বিকল্প অনুমানের সাহায্যে সাজিয়ে ফেলল। তারা মনে করল সৎ পথে চলা ও জীবন রক্ষা করা এই দুটি আদর্শের দ্বান্দ্বিকতা এখানে প্রধান দায়ী । এক্ষেত্রে ছাত্ররা মনে করলো এখানে জীবনরক্ষা করা আদর্শ অন্যান্য আদর্শ থেকে শ্রেয় তাই তারা বলে হাইনসের ঔষধ চুরি করে স্ত্রীর জীবন রক্ষা করাই কর্তব্য। অপরদিকে ছাত্রীরা কোন একটি নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হলো না। কারণ তারা এই দুটি কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধিত আরো অন্যান্য সম্ভাবনার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিচার করে এবং ছাত্রীদের মধ্যে কেউ বলে ওষুধের দোকানে গিয়ে ওষুধের দাম কমানোর অনুরোধ করা যেতে পারে, কেউ বলে যদি ওষুধ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে তার অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকার কেউ থাকবে না, এইভাবে তারা কোনো সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তিনি দেখলেন যে ছাত্রদের দেওয়া সমাধানের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে অপরদিকে ছাত্রীদের দেওয়া সমাধানের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ছাত্রদের দেওয়া সমাধান ও ছাত্রীদের দেওয়া সমাধানের মধ্যে একটা অমিল তিনি লক্ষ্য করলেন। এর দ্বারা তিনি অনুমান করলেন যে নৈতিক বিচার কখনোই লিঙ্গ অনপেক্ষ নয়। সমাজে নারী পুরুষের লিঙ্গ-স্বরূপ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি ভিন্ন ভিন্ন আদলে সৃজিত হয় এবং এই পার্থক্যের প্রতিফলন নারী-পুরুষের নৈতিক বিচারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় । এর থেকে গিলিগান অনুমান করেন যে নৈতিক বিচার লিঙ্গসাপেক্ষ । গিলিগান মানুষের কোন পূর্ব নির্ধারিত সামান্য ধর্ম স্বীকার করেন না অর্থাৎ তিনি এ্যারিস্টোটল এবং জন রলসের সাথে একমত নন যে 'মানুষ মাত্রই র‍্যাশনাল অ্যানিমাল'। তিনি মনে করেন পুরুষতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে নারী ও পুরুষের যে নিজ নিজ ধর্ম তৈরি হয়েছে তা আসলে পরিবেশজনিত কারণে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সৃজিত ধর্ম । স্নেহবৎসল্যের ভাবমূর্তি, বিভিন্ন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার বিশেষ দায়িত্ব নারী অর্জন করেছে । পাশাপাশি এই দায়িত্ব পালন করতে করতে নারীর নারীসুলভ প্রেক্ষিত গড়ে উঠেছে। অপরদিকে পুরুষ হয়ে উঠেছে আগ্রাসী । অন্যান্য সম্পর্কের

বেড়াজাল অতিক্রম করে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার প্রতি প্রতিভূ। যেখানে নারী সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে সেখানে পুরুষ অতি সহজেই যেকোন সম্পর্ক অস্বীকার করে স্বতন্ত্র হতে চেষ্টা করে । নারীর অভিজ্ঞতাকে তুচ্ছ, অপরিণত মনে করার পেছনে কাজ করে যাচ্ছে পুরুষতন্ত্র। যারফলে নারীর অভিজ্ঞতা দ্বারা যেখানে মানব সমাজ সমৃদ্ধ হওয়ার কথা সেখানে নারীর অভিজ্ঞতার দ্বারা মানব সমাজ সমৃদ্ধ হতে পারছে না । মানব সমাজের স্বার্থেই পুরুষতন্ত্র মুক্ত সমাজ গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । আমাদের এই সমাজে পুরুষতন্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে। বিভিন্নভাবে সমাজে নারীকে অবদমিত করে রাখার প্রয়াস অব্যাহত। নারীকে দুর্বল করে রাখার ট্র্যাডিশন মাতৃগর্ভে শুরু হয়ে যায়। বিজ্ঞানের উন্নত টেকনোলজির দৌলতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক আগেই আমরা জানতে পারি মাতৃগর্ভের ভ্রূণটি কন্যা না পুত্র । যদি কন্যা হয় তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কন্যা ভ্রূণটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয় । পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সমাজে আইন করেও কন্যাভ্রূণ নষ্ট-জনিত নীতি গর্হিত কাজ আটকানো যাচ্ছে না। যেসব কন্যা ভ্রূণকে ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া হয় তাদের বড় হয়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজ নারীত্ব নির্মাণ করে দেয় । সমাজের সমস্ত তত্ত্ব-কাঠামো, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রবর্তক হলো পুরুষ । এখানে নারী ও পুরুষের অবস্থান কি হওয়া বাঞ্ছনীয় তাও ঠিক করে দেয় পুরুষ । পুরুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তত্ত্ব ও মত একমাত্র বৈধ মত ও যৌক্তিকরুপে দাবি করা হয়। আর যেহেতু এটা যৌক্তিক তাই লিঙ্গনিরপেক্ষ এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুত্র সন্তান অপেক্ষা অবহেলিত পরিচর্যার মধ্য দিয়ে কন্যা সন্তানদের দুর্বল , পরনির্ভর , প্রতিবাদহীন জীবে পরিণত করা হয় । সমাজে একটি কন্যাশিশু ও একটি পুত্রশিশুর বড় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পুত্রশিশুকে ছোট থেকে শেখানো হয় সর্বদা সত্য কথা বলবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে । খেলনা হিসেবে হাতে তুলে দেওয়া হয় লাঠি, খেলনা-বন্দুক, তরোয়াল প্রভৃতি। অপরদিকে কন্যাশিশুটিকে বলা হয় কেউ কোন কথা বললে উত্তর দেবে না, উচ্চস্বরে কথা বলবে না, খেলনা হিসেবে হাতে তুলে দেওয়া হয় পুতুল ও রান্নাবাটি প্রভৃত্যি। এই ভাবে নারীকে ধীরে ধীরে দুর্বল ও প্রতিবাদহীন করে তোলা হয়।

আদর্শ সমাজঃ নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের উচিত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে । বলাবাহুল্য এরকম সমাজকেই প্রকৃত মানবতাবাদী সমাজ বলা হয়। মানবতাবাদী সমাজের প্রাক শর্ত নারীবাদ । মানবতাবাদী হতে গেলে আগে নারীবাদী হতে হবে । নারীবাদ এমন এক মতবাদ যেখানে দাবি করা হয় নারী সকল ক্ষেত্রে-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সমান অধিকার ভোগ করবে । নারীবাদের অনেকগুলি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে মুখ্য দুটি ভাগ হল যথা চরমপন্থী নারীবাদ (Radical Feminist) এবং উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminist)। চরমপন্থীরা মনে করেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির মধ্যে কাজ করে চলেছে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার পরিকাঠামো । এখানে কোন সাধারণীকরণ নিরপেক্ষ নিয়ম সম্ভব নয় বরং এই সকল নিয়ম বাতিল করে এক নতুন নিয়মতন্ত্রের গঠন করতে হবে যেখানে নারী তার অধিকার ভোগ করতে পারবে । উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন যে প্রতিটি মানুষই তিনটি পরিচয় বহন করে । এগুলি হল প্রথমত, আমাদের যৌন পরিচয় , দ্বিতীয়তঃ লিঙ্গ পরিচয় এবং তৃতীয়তঃ আমরা মানুষ । এই মানুষ পরিচয় অন্যান্য দুটি পরিচয়ের থেকেও নীতিগতভাবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । এরা বলেন যে লিঙ্গ-পরিচয় বা যৌন-পরিচয়ের ভিত্তিতে কোন নিয়ম-নীতি, তত্ত্ব-কাঠামো গঠন না করে, মানুষ পরিচয়ের দ্বারা বিশুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ম-নীতি, তত্ব-কাঠামো গঠন করা এবং এই নিয়ম-নীতির দ্বারা লিঙ্গ নিরপেক্ষ পক্ষপাতহীন নৈতিক বিচারব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা । উদারনৈতিক নারীবাদীরা অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প (Method of Inclusion) সমর্থন করেন। এরা বলেন যে, যে বিষয়গুলো এতদিন চিরাচরিত নীতিবিদ্যার (Traditional Ethics) আলোচ্য বিষয় ছিল না বা যে অভিজ্ঞতা গুলির বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন করা হয়নি সেই সব বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়গুলোর সমাধান খোজার চেষ্টা করা । যেমন 'অ্যাবর্শন' (Abortion) প্রথাগত নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টাকে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পের মাধ্যমে আলোচনা করা যেতে পারে এবং তার সমাধানসূত্র খোজা যেতে পারে । এই ভাবেই প্রথাগত নীতিবিদ্যার সীমাবদ্ধতাকে দূর করে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পের মাধ্যমে নীতিবিদ্যা কে আরো মানবিক করে তোলা যেতে পারে । উদারনৈতিক নারীবাদীরা বলেন যে যে নিয়মগুলো নারী-স্বার্থ ক্ষুন্ন করে সেগুলোর সংস্কার সাধন প্রয়োজন । তারা সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন । তারা বলেন যে সমাজের মূল কর্মকাণ্ডে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত করতে হবে এবং পুরুষদের সমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান

অধিকার দিতে হবে । উদারনৈতিক নারীবাদীরা আমেরিকায় ১৯৬৬-তে একটি সংগঠন (National Organisation for women) তৈরি করেন, এবং তারা দেশের ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টির কাছে আট দফা দাবি পেশ করেন । সেগুলো হলো -প্রথমতঃ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সমান অধিকার প্রদান করা, দ্বিতীয়তঃ কর্মক্ষেত্রে নারীদের মেটারনিটি লিভ (maternity leave) লাভের অধিকার এবং সোশ্যাল সিকিউরিটির (social security) সুবিধা, তৃতীয়তঃ শিশু দেখাশোনার জন্য কেন্দ্র নির্মাণ , চতুর্থত: একই শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা লাভের মাধ্যমে সমান অধিকার ও সমান শিক্ষা দেওয়া , পঞ্চমত: শিশু এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মরত অভিভাবকদের আয় করে ছাড় দেওয়া, ষষ্ঠতঃ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা এবং সমান প্রশিক্ষণের অধিকার দেওয়া, সপ্তমত: প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার মহিলাদের নিজেদের হাতে দেওয়া এবং অষ্টমতঃ নিয়োগ ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে । উদারনৈতিক নারীবাদীরাদের মতে এইভাবেই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর হতে পারে ।

এদের মতে এমন বিধি বিধি নিয়ম দ্বারা সমাজ পরিচালনা করতে হবে যেগুলি হবে নিরপেক্ষ । নারী ও পুরুষের লিঙ্গ পরিচয় কে বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ বিধি নিয়মের দ্বারা সমাজ পরিচালনা করতে হবে । এরা মনে করেন নারীর যৌন-স্বরূপ (sex-identity) শারীরিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত, এবং নারীর লিঙ্গ-স্বরূপ (gender-identity) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা রচিত । মানুষের যৌন স্বরূপ বা পরিচয় অস্বীকার করার কোন উপায় নেই । যদিও সমাজকৃত লিঙ্গ পরিচয় নারীকে পুরুষের অধীন করে রেখেছে । পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ঠিক করে দেয় একজন নারী ও পুরুষের আদর্শ গুণগুলি কি হবে । এই জন্য নারী তাদের অবদমনের জন্য লিঙ্গ পরিচয়কেই দায়ী করে তাই তারা এই লিঙ্গপরিচয়কে অস্বীকার করে । পুরুষের অধীনতা অস্বীকার করে সমঅধিকার দাবী করে । তারা বলে যে নৈতিক বিচারের জন্য তার যৌন পরিচয় বা লিঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন নেই বরং সে যে একজন মানুষ এই পরিচয়টা নৈতিক বিচারের মানদন্ড হওয়া উচিত। এরা দাবি করেন যে এই সমাজে যে নিয়ম নীতি গুলিকে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কেবলমাত্র সেই নিয়মগুলি সংশোধন করা এবং মানবহিতকর নিয়মগুলি রেখে এক নতুন নিয়মতন্ত্র গঠন করা।

চরমপন্থী নারীবাদীরা উদারনৈতিক নারীবাদীদের মত অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প সমর্থন করেন না। তারা পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ সাধারণীকরণের (impersonal, neutral generalization) সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। এরা বলেন যে মানুষের কোন লিঙ্গ-অনপেক্ষ অবস্থান সম্ভব নয়। তবে লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে সাম্যবস্থা আনা যেতে পারে। এরা লিঙ্গ-অনপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও বিশুদ্ধ যুক্তির সম্ভাবনা খারিজ করে দেন। এরা অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পে বিশ্বাসী নয় তাই তারা প্রচলিত তন্ত্রের পুনর্বিন্যাস অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন তন্ত্রের কথা বলেন।

এইজন্য তারা চিরাচরিত দ্বিমাত্রিক লজিকের বিকল্পের কথা বলেন । তারা দ্বিমাত্রিক লজিকের বিকল্প হিসাবে প্যারা কনসিসটেন্ট (para-consistent) লজিক, ফাজি (fuzzy) লজিক মেনি-ভ্যালুড (many-valued) লজিক, ভেগ লজিক (vague) প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন । অর্থাৎ কোন বিষয়কে সত্য অথবা মিথ্যা এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে একটি হতেই হবে এমনটি নয়. বর্তমানে আমরা দেখতে পাই এই দুটি সম্ভাবনা ছাড়াও আরো অন্যান্য সম্ভাবনা থাকে। যেমন আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যাও হতে পারে।

দ্বিমাত্রিক লজিক পরস্পর বিরোধী দুটি সম্ভাবনার মাঝামাঝি অন্য কোনো সম্ভাবনা অস্বীকার করে। সেই জন্যই বর্তমান সমাজের নারী-বৈষম্য জনিত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ । সেইজন্যই দ্বিমাত্রিক লজিকের বিকল্প লজিক -এর প্রয়োজনীয়তা, যে লজিকে পরস্পর বিরোধী সম্ভাবনা ছাড়াও পরস্পর বিরোধী দুটি সম্ভাবনার মধ্যবর্তী সম্ভাবনা স্বীকার করা হয় ।

চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন যে তত্ত্ব ও প্রয়োগ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং তারা আরও মনে করেন যে প্রতিটি লজিকের সিস্টেমের সঙ্গে একটা করে র‍্যাশনাল প্যাকটিস অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত । তাই লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে গেলে আমাদের তত্ত্বের নিয়ামক চিন্তাতন্ত্রে বদল আনতে হবে । এরা সবসময় বৈষম্যের মূল কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন । তারা মনে করেন স্বার্থপরতা ও ক্ষমতাই লিঙ্গ বৈষম্যের মুল কারন। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণেই ক্ষমতার অসম বন্টন ও অবদমন সমাজে লক্ষ্য করা যায় । চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন যে লিঙ্গবৈষম্যের বীজ নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং পরবর্তীকালে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করেন পিতৃতন্ত্রে সর্বদাই একটি কেন্দ্র আছে । এই কেন্দ্রে পুরুষের অবস্থান এবং এই কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতেই একটা প্রান্ত রয়েছে, সেই প্রান্তে নারীর অবস্থান এবং কেন্দ্রে যার অবস্থান সে উত্তম এবং প্রান্তে যার অবস্থান সে অধম । এই পিতৃতন্ত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সম বন্টন সম্ভব

নয়। কারণ পিতৃতন্ত্রে প্রতিটি রীতিনীতি কেন্দ্রে অবস্থিত পুরুষের স্বার্থেই গঠন করা হয় তাই নারীরা এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত এবং অবদমিত হয় । উদারনৈতিক নারীবাদ প্রান্তের উন্নতির জন্য প্রান্তকে কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রেডিক্যাল নারীবাদ তিনি বলেন যেখানে কেন্দ্র ও প্রান্ত এই দুটি পক্ষ স্পষ্ট বর্তমান সেখানে কখনোই এই দুটি পক্ষের মধ্যে দূরত্ব মোচন করা যায় না বা বৈষম্য মোচন করা যায় না কেননা প্রান্তকে আবার কেননা প্রান্তকে কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত করে যখন তন্ত্র গঠন করা হবে তখন আবার নতুন কেন্দ্র এবং প্রান্ত তৈরি হয়ে যাবে কেননা কেন্দ্র ও প্রান্ত ছাড়া কেননা কেন্দ্র ও প্রান্ত দুটি পরস্পর বিরোধী পক্ষ ছাড়া কোন তন্ত্র কল্পনা করা যায় না অর্থাৎ কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে পার্থক্য কখনোই ঘুচবে না। চরমপন্থী নারীবাদীরা এমন এক তন্ত্র গঠনের চেষ্টা করেন যেখানে কেন্দ্র ও প্রান্তের দুটি স্পষ্ট কোটি নেই, এরা পরস্পর ভিন্ন হলেও সমান মূল্যবান হতে পারে । এরা বলেন যে দুটি পক্ষ পরস্পর ভিন্ন হলেও একে অপরের সাথে যুক্ত হতে পারে ।

চরমপন্থী নারীবাদীরা ব্যক্তিকে একক বিচ্ছিন্ন সত্যরূপে দেখেন না। এরা বলেন যে প্রতিটি ব্যক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই পরস্পর নির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়েই তাদের গড়ে ওঠে ব্যক্তিসত্তা এবং তাদের পরস্পর নির্ভরশীলতার অনুভবই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতি প্রদান করে। এই তন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার স্বগত মূল্য (intrinsic value) স্বীকার করা হয়। এখানে প্রতিটি ব্যক্তিকে অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সত্তা রূপে বিচার করা। বিচ্ছিন্ন সত্তা রূপে তাদের দেখা হয়না । তাই এখানে এক ব্যাক্তি দ্বারা অপরের অবদমনে, নিপীড়ন, হিংসা প্রভৃতির কোনো সম্ভাবনা থাকেনা। এই তন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের স্বগত মূল্য বা স্বতঃ মূল্য স্বীকার, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে। এই তন্ত্রের মন্ত্র হল "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"-। এই তন্ত্রে মানুষ হিসাবেই তাদের গণ্য করা হয়। মানুষের লিঙ্গ পরিচয় ও যৌন পরিচয় দ্বারা নৈতিক বিচার প্রভাবিত হয় না অর্থাৎ এই তন্ত্রে বিচারকে লিঙ্গ অনপেক্ষ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে । সর্বোপরি বলতে হয় নারীবাদের এই নতুন তন্ত্র লিঙ্গ সাপেক্ষতার গণ্ডি পেরিয়ে এক মানবতন্ত্র গঠনের প্রয়াস, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষ। এখানে কোনো মানুষই কম মূল্যবান বা বেশি মূল্যবান নয় সবাই সমান মূল্যবান । এই তন্ত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপরে মানব সত্ত্বা। এখানে যেন বলতে চেয়েছে- "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই".

পাদটীকা:

1. সিংহ, কঙ্কর। 'ধর্ম ও নারীঃ প্রাচীন ভারত'। কলকাতাঃ র‍্যাডিক্যাল , ২০১২, পৃ ৩৫।
2. বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী । 'নারী শ্রেণি ও বর্ণঃ নিম্নবর্গের নারীর অর্থ সামাজিক অবস্থান'। কলকাতাঃ মিত্রম্ , ২০০৯। পৃ ১৮
3. সিংহ, কঙ্কর। 'ধর্ম ও নারীঃ প্রাচীন ভারত'। কলকাতাঃ র‍্যাডিক্যাল , ২০১২ , পৃ ২৭
4. Lamont, Corliss. 'The Philosophy of Humanism' (8th Ed, Rev.). New Yourk: Humanist Press, 1997, p. xiii
5. Ibid, p.xiii
6. Wani, Irshad A. 'The Sociology: a Study of Society'. New Delhi: Educreation Publishing, 2011, p. 144.
7. Ibid p. 144.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

1. বন্দ্যোপাধ্যায় ,কল্যাণী। 'নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আলোর দিশা'। কলকাতাঃ মিত্রম্ , ২০১২।
2. বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী । 'নারী শ্রেণি ও বর্ণঃ নিম্নবর্গের নারীর অর্থ সামাজিক অবস্থান'। কলকাতাঃ মিত্রম্ , ২০০৯।
3. বরুয়া, সুপর্ণা লাহিড়ী। 'নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম'। কলকাতাঃ র‍্যাডিক্যাল, ২০১১।
4. Lamont, Corliss. 'The Philosophy of Humanism' (8th Ed, Rev.). New Yourk: Humanist Press, 1997
5. মৈত্র, শেফালী। 'নৈতিকতা ও নারীবাদঃ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা'। কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।
6. সিংহ, কঙ্কর। 'ধর্ম ও নারীঃ প্রাচীন ভারত'। কলকাতাঃ র‍্যাডিক্যাল , ২০১২,

7. সিংহ, কংকর। (অনুবাদ) 'দ্বিতীয় লিঙ্গঃ সিমোন দ্য বোভোয়ার'। কলকাতাঃ র‍্যাডিক্যাল, ২০১১।
8. বসু, রাজশ্রী এবং চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদনা)। 'প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা'। কলকাতাঃ উর্বী প্রকাশন, ২০০৮।
9. Wani, Irshad A. 'The Sociology: a Study of Society'. New Delhi: Educreation Publishing, 2011.